

## ষষ্ঠ অধ্যায় বনায়ন

বনায়ন হলো বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা। সঠিকভাবে বনায়ন করা সম্ভব হলে, সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এসব বনজ দ্রব্য হলো কাঠ, জ্বালানি, বনৌষধি, ফল, মধু, মোম প্রভৃতি। বনায়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকার বনজ বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। এ অধ্যায়ে আমরা এসব উদ্ভিদের পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করব। কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী কাঠ ও বাঁশের গুরুত্ব বলতে পারব। কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরি করতে পারব। প্রাত্যহিক জীবনে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার বলতে পারব। এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ফলদ, বনজ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি বৃক্ষের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বনজ দ্রব্যের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

### পাঠ-১ : ফলদ বৃক্ষ কাঁঠালের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

**পরিচিতি:** কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। অন্য সব ফলের চেয়ে কাঁঠাল আকারে বড়।

কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus*।

কাঁঠাল একটি দ্বি-বীজপত্রী, কাষ্ঠল ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। কাঁঠাল গাছের উচ্চতা ২১ মিটার পর্যন্ত হয়। কাঠ শক্ত ও হলদে রঙের হয়। বীজ সাদা ও ফুল সবুজ রঙের হয়। পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি এবং সবুজ। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে রোপণ করা হয়ে থাকে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাস কাঁঠালের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয়। গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের ভাওয়াল এলাকায় কাঁঠালের বাগান করা হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর এলাকায় কাঁঠাল চাষ করা হয়। কাঁঠাল লাল মাটির উঁচু জমিতে ভালো জন্মে। এ উদ্ভিদের কাঠ ও ফলের প্রচুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

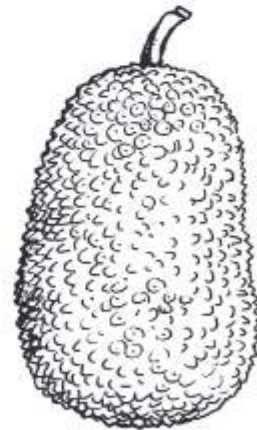


চিত্র - ৬.১ : কাঁঠাল গাছ

বাংলাদেশে কাঁঠালের অনুমোদিত জাত কম। কেবল বারি উদ্ভাবিত কয়েকটি জাত ও লাইন রয়েছে। কাঁঠাল সাধারণত বছরে একবার ফল দেয়। কোয়ার গুণের ভিত্তিতে কাঁঠালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- ১। খাজা কাঁঠাল - এসব কাঁঠালের কোয়া শক্ত।
- ২। আধারসা কাঁঠাল - এসব কাঁঠালের কোয়া মুখের দিকে শক্ত কিন্তু পিছনের দিকে নরম।
- ৩। গলা কাঁঠাল - এসব কাঁঠালের কোয়া নরম। মুখে দিলেই গলে যায়।

**গুরুত্ব :** কাঁঠাল একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ। পাকা কাঁঠালের রসাল কোয়া খুবই মিষ্টি। শর্করা ও ভিটামিনের অভাব মেটাতে পাকা কাঁঠালের জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এর রং গাঢ় হলুদ। এ কাঠ খুবই টেকসই এবং ভালো পলিশ নেয়।



চিত্র-৬.২ : কাঁঠাল



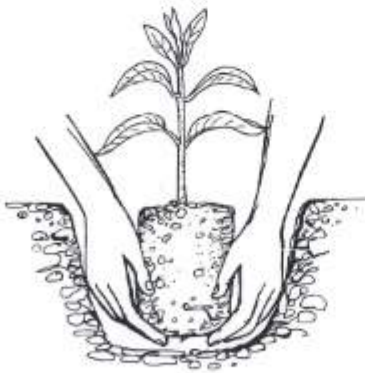
বাসগৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। ঘরের সব রকম আসবাবপত্র তৈরিতে কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাঁঠাল কাঠ এবং পুষ্টির জন্য এর ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁঠাল পাতা দুর্যোগকালীন সময়ে গরু-ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

### চাষ পদ্ধতি

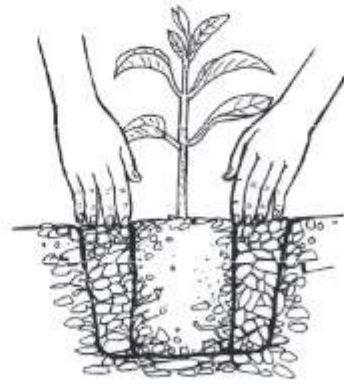
**জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি:** বন্যামুক্ত সব ধরনের মাটিতে কাঁঠালের চাষ হয়। তবে পলি-দোআঁশ বা অল্প লালমাটির উঁচু জমিতে কাঁঠাল চাষ খুব ভালো হয়। কাঁঠালের জমি কয়েকবার লাজল ও মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। চারা রোপণের একমাস আগে ১০ মিটার দূরে দূরে ১মিটার x ১মিটার x ১ মিটার আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির সময় উপরের ও নিচের মাটি আলাদা রাখতে হবে। এবার গর্তে জমাকৃত উপরের মাটি নিচে দিয়ে নিচের মাটির সাথে সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। সারের পরিমাণ হবে – পচা গোবর ২০ কেজি, হাড়ের গুঁড়া ৪০০ গ্রাম অথবা টিএসপি ১৫০ গ্রাম, ছাই ২ কেজি অথবা এমওপি ১৫০ গ্রাম।

**চারা রোপণ ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা:** বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম পদ্ধতিতে চারা করে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাস উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হয়। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলাদা করে দিতে হবে।

**সার প্রয়োগ:** কাঁঠাল গাছে প্রতি বছর সার প্রয়োগ করতে হবে। ২-৫ বছর বয়সের গাছে গোবর সার ৩০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম এবং এমওপি ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। ফলবতী গাছে পচা গোবর ৫০ কেজি, ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম এবং এমওপি ৮০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।



চারা বসানো হচ্ছে



চারার চারপাশে মাটি চেপে দেওয়া হচ্ছে

চিত্র-৬.৩ : চারা রোপণ

**ফল সংগ্রহ:** কাঁঠাল গাছে জাতভেদে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ফুল আসে এবং ফল ধরার তিন মাসের মধ্যে কাঁঠাল পুষ্ট হয়। ফল পরিপক্ব হলে গায়ের কাঁটাগুলো ভোঁতা হয়ে যায় এবং বোঁটার কষ পাতলা হয়। তাছাড়া টোকা দিলে টন টন শব্দ হয়।

**কাজ :** কাঁঠাল গাছ পর্যবেক্ষণ (দলগত কাজ)।

কাঁঠাল চারা, পাতাসহ নমুনা ডাল, ফুল, ফল ও বীজ পর্যবেক্ষণ কর। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টার কাগজে লেখ। এবার দলগতভাবে উপস্থাপন কর।

**নতুন শব্দ :** চিরহরিৎ বৃক্ষ, সরল পাতা

## পাঠ-২ : বনজ বৃক্ষ মেহগনির পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

**পরিচিতি :** মেহগনির আদি নিবাস জামাইকা ও মধ্য আমেরিকা। মেহগনি গাছের প্রজাতি হিসেবে ২টি নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে *Swietenia macrophylla* প্রজাতি প্রধান। যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে মেহগনি গাছ বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনায়ন সৃষ্টিতে প্রায় সারা দেশে ব্যাপক হারে এ গাছ লাগানো হচ্ছে। সড়ক, বাঁধ, বসতবাড়ি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণ, সামাজিক বন ও ব্যক্তিগত বনবাগানে এ গাছের চাষাবাদ বাড়ছে।



চিত্র-৬.৪ : : মেহগনি গাছ

এটি একটি দ্বিবীজপত্রী কাষ্ঠল উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা, শক্ত ও বাদামি রঙের। পাতা যৌগিক। ফুল সবুজাভ-সাদা। ফল বাদামি রঙের, ডিম্বাকৃতি এবং আকারে বেশ বড়। শীতকালে এ বৃক্ষের সব পাতা ঝরে যায়। এ জন্য একে পত্রঝরা উদ্ভিদ বলে। মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করতে হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বুনতে হয়। জুন থেকে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত মেহগনি চারা রোপণ করা হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে। মেহগনি উন্নতমানের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। বাসগৃহের দরজা জানালা,

আসবাবপত্র তৈরিতে মেহগনি কাঠের খুব কদর রয়েছে। মেহগনি কাঠের আঁশ খুব মিহি এবং কালচে খয়েরি রঙের। এ কাঠ খুব ভালো পলিশ নেয়।

**গুরুত্ব :** মেহগনি কাঠ খুবই শক্ত ও টেকসই। এ কাঠের রং লালচে খয়েরি। তবে গাছ বেশি পরিপক্ব হলে, কাঠের রং অনেক সময় গাঢ় কালচে খয়েরি রঙের দেখায়। এ কাঠের আঁশ খুবই মিহি। এ কাঠ খুব সুন্দর পলিশ নেয়। বাসগৃহের সব রকম আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠের বহুল ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া ঘরের দরজা, জানালার ফ্রেম তৈরিতেও মেহগনি কাঠ উত্তম। মেহগনি কাঠ দিয়ে হরেক রকমের সৌখিন শিল্প সামগ্রীও তৈরি হয়।



চিত্র-৬.৫ : মেহগনির পাতা, ফুল ও ফল

#### চাষ পদ্ধতি

**বীজ সংগ্রহ ও রোপণ:** মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করা হয়। তবে স্টাম্প বা মোথাও রোপণ করা যায়। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বা পলিব্যাগে বুনতে হয়। দুই ভাগ দোআঁশ মাটি ও একভাগ জৈব সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে পলিব্যাগে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি পলিব্যাগে দুটি বীজ বপন করতে হয়। বেডের সারিতে ৮-১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। মাটির ৩-৪ সেমি গভীরে বীজ ঢুকিয়ে দিতে হয়। বীজ একটু কাত করে লাগাতে হবে যেন বীজের পাখা উপরের দিকে থাকে। বীজ বপনের পর হালকা সেচ দিতে হবে। ছোট অবস্থায় চারায় দুপুর রোদের সময় ছায়ার জন্য ঢাকনা দিতে হবে। এই চারা শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বা পরের বছর রোপণ করা হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমে ২০-৩০ দিন লাগে। চারার রোপণ দূরত্ব ৯-১০ মিটার হলে ভালো হয়।

**মাটি তৈরি:** উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে। দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ মাটি মেহগনি গাছের জন্য উত্তম। চারা রোপণের পূর্বে নির্বাচিত জায়গা আবর্জনামুক্ত ও সমান করে নিতে হবে। চারার আকার অনুসারে গর্তের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ৬০-৮০ সেমি হওয়া দরকার। গর্ত করার পর গর্তের মাটিতে সার মেশাতে হবে। সার মেশানো মাটি দিয়ে ভরাটকৃত গর্ত ১৫ দিন ফেলে রাখতে হবে। অতঃপর মাটি পুনরায় কুপিয়ে বুরবুরে করে চারা রোপণ করতে হবে।

#### সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা

**মাটি তৈরির সময় সার প্রয়োগের নিয়মাবলি:** মাটি তৈরির সময় জৈব সার ১০-১৫ কেজি, ছাই ১-২ কেজি, ইউরিয়া ২০০-৩০০ গ্রাম, টিএসপি ১০০-৫০০ গ্রাম ও এমওপি ৫০-১০০ গ্রাম দিতে হয়। ঝরার



সময় পানি সেচ দিতে হবে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। চারা অবস্থায় মূল গাছের পার্শ্বকুঁড়ি অপসারণ করতে হবে। চারায় খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে। সেচের পর গাছের গোড়ায় মাগচিং বা জাবড়া দিতে হবে। গাছ বড় হওয়ার পর ডাল ছাঁটাই করে কাঠামো তৈরি করতে হবে।

কাজ- ১: মেহগনি চারা, পাতাসহ ডাল, ফল ও বীজ পর্যবেক্ষণ কর। দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।	
পর্যবেক্ষণের বিষয়	মেহগনি গাছের বৈশিষ্ট্য
১. কী ধরনের উদ্ভিদ	
২. কাণ্ড	
৩. বীজ	
৪. ফুল	
৫. কোথায় কোথায় চাষ হয়	
৬. কেমন মাটিতে চাষ হয়	
৭. প্রধান প্রধান গুণগুণ	

কাজ- ২: মেহগনি চারা রোপণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত কর।

নতুন শব্দ : পত্রঝরা উদ্ভিদ, যৌগিক পাতা, মাগচিং

### পাঠ-৩ : নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভিদ বাঁশের পরিচিতি, গুণগুণ ও চাষ পদ্ধতি

**পরিচিতি :** গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বাঁশ পরিচিত। গ্রিবেক কুটির থেকে বড় বড় অটালিকা তৈরিতেও বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের দেশের সর্বত্রই বাঁশ চাষ হয়। বাঁশ সাধারণত মোথা বা রাইজোম থেকে চাষ করা হয়। বীজ থেকেও বাঁশের চাষ হয়ে থাকে। বাঁশ সাধারণত ৫ থেকে ৭ মিটার লম্বা হয়। বাঁশ খুবই শক্ত। কাঁচা বাঁশ সবুজ হয়। পরিপক্ব বাঁশ হালকা ঘিয়ে রঙের হয়। বাঁশের চিকন চিকন ডালকে কঞ্চি বলা হয়। বাঁশের পাতা চিকন ও লম্বাটে আকৃতির। বাঁশ গাছে একশত বছরে একবার ফুল ও বীজ হয়। প্রাকৃতিকভাবেও বাঁশ বাগান তৈরি হয়।



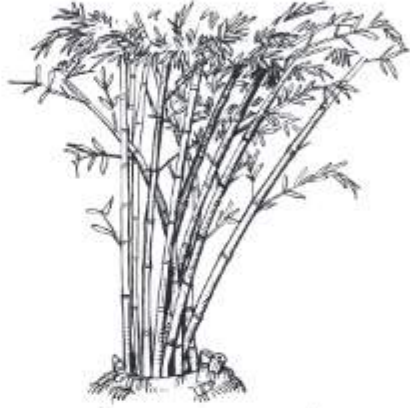
চিত্র-৬.৬ : বাঁশবাড়

বাংলাদেশে প্রায় ২৩ রকমের বাঁশ দেখা যায়। এলাকা ভিত্তিক বাঁশ প্রধানত দুই প্রকার।

১. বন জঙ্গলের বাঁশ : যেমন— মূলি, মিতিজা, ডলু, নলি তল্লা, বেতুয়া, মাকলা, এসব বাঁশের দেয়াল পাতলা।

২. গ্রামীণ বাঁশ : যেমন— উরা, বরাক, বড়ুয়া, মরাল এসব বাঁশের দেয়াল পুরু।

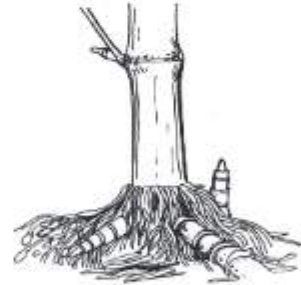
**গুরুত্ব :** বাঁশকে গরিবের কাঁচ বলা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাঁশ বিরাট ভূমিকা রাখে। গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। বাঁশ গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, কুলা, বাঁপি, মাথাল প্রভৃতি তৈরি হয়। খাল পারাপারে বাঁশের সাকো ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বাঁশি গ্রামের শিশু-কিশোরদের বাদ্যযন্ত্র। কৃষি উপকরণ যেমন লাঙ্গাল, জোয়াল, আঁচড়া ও কোদাল তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়। শস্য ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়। কাগজ ও রেয়ন তৈরির কাঁচামাল হিসেবে শিল্প কারখানায় বাঁশ ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৬.৭ : বরাক বাঁশ

**চাষ পদ্ধতি :** বাঁশ আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী। বাংলাদেশের সর্বত্রই বাঁশের চাষ হয়। বাঁশ ৩টি উপায়ে চাষ করা হয়। যথা—মোথা ও অফসেট পদ্ধতি, প্রাককঞ্চি কলম পদ্ধতি, গিট কলম পদ্ধতি।

১. মোথা বা অফসেট পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ: বাঁশ চাষের জন্য ১-৩ বছর বয়সী মোথা বা অফসেট সংগ্রহ করতে হয়। বাঁশের গোড়ার দিকে ৩-৪টি গিটসহ মাটির নিচের মোথাকে অফসেট বলে। অফসেটের জন্য নির্বাচিত বাঁশ অবশ্যই সতেজ হতে হবে। চৈত্র মাস অফসেট সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত অফসেট অস্থায়ী নার্সারিতে বালির বেড়ে লাগানো আবশ্যিক। ১৫-২৫ দিনের মধ্যে অধিকাংশ অফসেট থেকে নতুন পাতা ও ঝুড়ি গজায়। এ অফসেট আষাঢ় মাসে তিনভাগ মাটি ও একভাগ গোবর দিয়ে তৈরি গর্তে লাগাতে হয়।



চিত্র-৬.৮ : বাঁশের মোথা

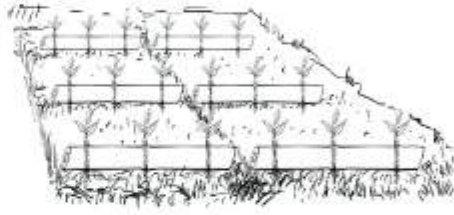
২. প্রাকমূল কঞ্চি কলম পদ্ধতি: বাঁশের অনেক কঞ্চির গোড়ায় প্রাকৃতিকভাবেই শিকড় গজায়। এ ধরনের শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চিকে প্রাকমূল কঞ্চি বলে।



চিত্র-৬.৯ : বাঁশের কাণ্ডসহ প্রাকমূল কঞ্চি

ফাল্গুন হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সময়ে এক বছরের কম বয়সী বাঁশ থেকে করাত দিয়ে সাবধানে শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চি কলম কেটে নিতে হবে। সংগৃহীত কলম দেড় হাত লম্বা করে কেটে বালি দিয়ে প্রস্তুত অস্থায়ী বেডে ৭-১০ সেমি গভীরে খাড়া করে বসাতে হবে। নিয়মিত দিনে ২-৩ বার পানি দিলে এক মাস পরে সতেজ চারা তৈরি হবে। পলিব্যাগে ৩:১ অনুপাতে মাটি ও গোবরের মিশ্রণে চারাগুলো স্থানান্তর করতে হবে। এভাবে এক বছর রাখার পর কঞ্চি কলম বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঠে লাগাতে হবে।

**৩. গিঠ কলম পদ্ধতি:** বাঁশের কাণ্ডকে টুকরা টুকরা করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে গিঠ কলম পদ্ধতি বলে। ১-৩ বছরের সবল বাঁশ নির্বাচন করতে হবে। সদ্য কাটা বাঁশকে ৩ গিঠ সহ লম্বা লম্বা খণ্ডে ভাগ করতে হবে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিভক্ত খণ্ডগুলো সাথে সাথে অস্থায়ী বেডে সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে দিতে হবে। নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।



চিত্র- ৬.১০ : অস্থায়ী বেডে গিঠ কলম

বাঁশের টুকরার গিঠের কুড়ি সতেজ ও অক্ষত আছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের দিকে অধিকাংশ গিঠ কলমে শিকড় গজাবে। বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই শিকড়সহ গিঠ কলম বেড থেকে উঠিয়ে নিয়ে মাঠে লাগাতে হবে।

**বাঁশের পরিচর্যা:** নতুন বাঁশঝাড়ে খরার সময় পানি সেচ দিতে হবে। মোথার গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ মোথাসহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঁশের ঝাড়ে নতুন মাটি দিলে সুস্থ সবল নতুন বাঁশ পাওয়া যাবে।

**বাঁশ সংগ্রহ :** বাঁশ পরিপক্ব হতে ৩ বছর সময় লাগে। এ জন্য ঝাড় থেকে ৩ বছর বয়সী বাঁশ সংগ্রহ করতে হবে। বাঁশ গজানোর মৌসুমে কখনো বাঁশ কাটা উচিত নয়। একবারে ঝাড়ের সব পরিপক্ব বাঁশ কাটাও উচিত নয়।

**কাজ :** তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মোথা পদ্ধতি, প্রাকমূলকঞ্চি কলম পদ্ধতি ও গিঠ কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ নিয়ে আলোচনা কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর (সময় ১৫ মিনিট)।

**নতুন শব্দ :** অফসেট পদ্ধতি, গিঠকলম পদ্ধতি, প্রাকমূলকঞ্চি পদ্ধতি

#### পাঠ-৪: ঔষধি বৃক্ষ নিম্ন গাছের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

**পরিচিতি :** মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য অনেক সময় উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। এসব উদ্ভিদকে কী বলা হয়? তোমার চেনা কয়েকটি ঔষধি উদ্ভিদের নাম বল। অর্জুন, হরিতকী, আমলকী, প্রভৃতি ঔষধি বৃক্ষের নমুনা বা চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। এবার তুলসী, থানকুনি, বাসক, গাঁদা প্রভৃতি ঔষধি লতাগুলোর নমুনা বা চার্টের চিত্র বা ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। তোমাদের বাড়িতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব ঔষধি বৃক্ষ ও লতাগুলো রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দলে আলাপ কর।





চিত্র-৬.১১ : নিম গাছ



চিত্র-৬.১২ : পাহাড়ি নিম পাতা

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই নিম গাছ দেখা যায়। নিমের কমপক্ষে ২টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হলো *Melia azedarach* (ঘোড়া নিম) এবং *Azadirachta indica*। নিম মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রবরা বৃক্ষ। ১০ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নতুন পাতা গজায়। পাতা যৌগিক, ৯-১৫টি পত্রফলক থাকে। পত্রফলকগুলো লম্বাটে, তির্যক ও বর্ষাকৃতির হয়। পত্রফলকের কিনারা ঝাঁজকাটা। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতির। ফল পাকলে হালকা হলদে হয়।

বংশবিস্তার : বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করা হয়। মূল ও কাণ্ডের কাটিংয়ের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুন-জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

গুরুত্ব : নিম গাছের ব্যবহার অনেকভাবে হয়ে থাকে। তবে এর ঔষধিগুণ মানুষের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। নিমপাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে। চর্মরোগে নিম পাতার রস ও নিমের তেল ব্যবহারে উপকার হয়। নিম পাতার রস কৃমির উপদ্রব কমায়। নিমের শুকনা পাতা কাপড়ের ও চালের পোকা দমনে ব্যবহার হয়। নিমের ডাল ভালো দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার হয়। নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম গাছের বাকল বাতজ্বর, দাদ, বিখাউজ, একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পুঁজ পড়া, পায়রিয়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকলের রস দাঁতের মাড়ি শক্ত করে।

### চাষ পদ্ধতি

**জমি প্রস্তুত :** আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু নিম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটিতে নিম চাষ ভালো হয়। জমি প্রথমে ভালোভাবে পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত করে চাষ দিতে হবে।

**চারা উৎপাদন :** জুন-জুলাই মাস নিমের বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। পাকা ফল থেকে খোসা ছাড়িয়ে বীজ আলাগা করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। বীজ সংগ্রহের এক সপ্তাহের মধ্যেই চারা উৎপাদনের জন্য পলিব্যাগে বপন করতে হয়। উৎপাদিত চারা এক বছর পর মে-জুন মাসে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

**গর্ত তৈরি ও চারা রোপণ :** নিমের চারা রোপণের জন্য ৭ মিটার x ৭ মিটার দূরত্বে ১ মিটার x ১ মিটার x ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি একদিকে ও নিচের মাটি আরেক দিকে রাখতে হবে। তারপর গর্ত ও গর্তের মাটি ১৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। গর্তের নিচের মাটির সাথে পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার মিশিয়ে এবং উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এর ১৫ দিন পর এক বছর বয়সের চারা গর্তের মাঝখানে রোপণ করতে হবে। চারার গোড়ায় মাটি একটু উঁচু করে দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।

**পরিচর্যা :** চারার গোড়ায় খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলাগা করে দিতে হবে। জমিতে আগাছার উপদ্রব দেখা দিলে নিড়ানি দিতে হবে। নিম গাছে সাধারণত রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম দেখা যায়।

**ফসল সংগ্রহ ও ফলন :** নিম গাছের পাতা, ফুল, ফল, বীজ ও তেল বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার করা হয়। গাছ রোপণের ৮-১০ বছরের মধ্যে তা থেকে পাতা, ছাল, ফল ও বীজ সংগ্রহ করা যায়।

**কাজ :** নিম চারা রোপণ করা [দলীয় কাজ]।

তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাক্ষণে দলগতভাবে নিমের চারা রোপণ কর।

**নতুন শব্দ :** পাতার নির্যাস, জীবাণুনাশক

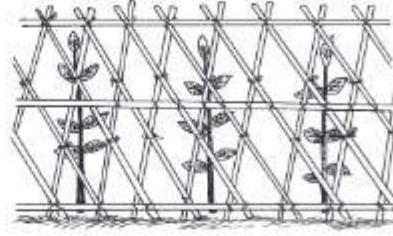
### পাঠ-৫ : বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ

#### বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ

আমাদের বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ। আবার নানা কারণে বিরাজমান বনজ সম্পদও ধ্বংসের মুখোমুখি। এই বনজ সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হলে বনায়ন দরকার। আমাদের চারপাশের নতুন রোপণ করা চারা ও বন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।



চারায় পানিসেচ দেওয়া



চারায় বেড়া দেওয়া



কাষ্ঠল বৃক্ষ (প্রুনিং এর পূর্বে)



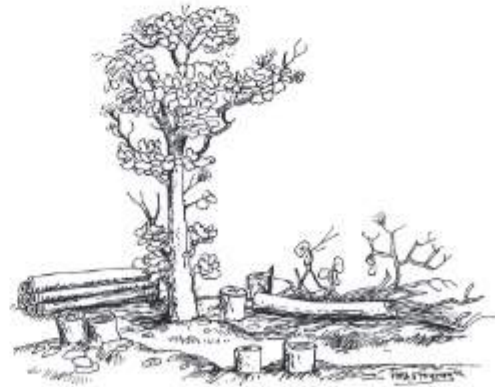
কাষ্ঠল বৃক্ষ (প্রুনিং এর পরে)

চিত্র-৬.১৩ : বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সংরক্ষণ

কাজ : রোপণ করা চারা ও বৃক্ষ সংরক্ষণ

১. উপরের চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। রোপণ করা চারা সংরক্ষণের উপায়গুলো লেখ।
২. প্রুনিং এর মাধ্যমে কাষ্ঠল বৃক্ষ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

কাষ্ঠল বৃক্ষকে মূল্যবান করে তোলার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কর্তন করাকে প্রুনিং বলা হয়। গাছকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রুনিং করা হলে কাঠের পরিমাণ ও মান উন্নত হয়। সড়ক বাঁধ, বসতভিটা সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিচর্যা না করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। চারা ছত্রাকজনিত রোগ বা পোকা-মাকড় দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ আক্রান্ত হলে রাসায়নিক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক দিয়ে তা দমন করতে হবে। তবে প্রাকৃতিকভাবে রোগবাহাই দমন করতে পারলে খুবই ভালো হয়।



চিত্র-৬.১৪ : বিপন্ন শালবন



## বন সংরক্ষণ

### আনুর বন ভ্রমণের গল্প

গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশে আনুর খুবই পছন্দ। শীতের ছুটিতে সে বাবার সাথে গাজীপুরের শালবন ভ্রমণে গেল। বনের শাল ও গর্জন গাছ দেখে সে আনন্দিত হলো। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বনের গাছ কেটে উজাড় করার দৃশ্য তাকে খুবই কষ্ট দিল। সে দেখলো বন দখল করে মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণ করছে। এ ছাড়া নানা উপায়ে বন ধ্বংস করে দখলের পালা চলছে। তার বাবা বললেন আরও বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এ বন ছিল। বনে হরেক রকমের পশুপাখি দেখা যেতো। বাবার কাছে আরও জানল বনদস্যুরা এ বনের বৃক্ষ কেটে চুরি করে বিক্রি করছে। আনু আমাদের দেশের বন রক্ষা করার উপায় নিয়ে সারারাত ভাবল। তার খাতায় সে বন রক্ষার উপায় সম্পর্কে লিখলো।

উপায়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো -

১. বনদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে।
২. জনগণকে বনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।
৩. সামাজিক বন সৃষ্টিতে সবাইকে অংশ নিতে হবে।
৪. বনের পশু-পাখি ধ্বংস করা যাবে না।
৫. স্বাভাবিক নিয়মে বন সৃষ্টিতে বাধা দেওয়া যাবে না।
৬. বন সংরক্ষণ আইন জানব এবং সবাইকে তা মেনে চলার পরামর্শ দিব।
৭. জনগণকে বন সংরক্ষণে সচেতন করব।

**কাজ :** তোমরা সবাই আনুর বন ভ্রমণের গল্প মন দিয়ে শোন। দলগতভাবে বন সংরক্ষণে আরও কী কী উপায় অবলম্বন করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা কর। পোস্টার পেপারে চিত্রটি সম্পন্ন করে দলগত উপস্থাপন কর।



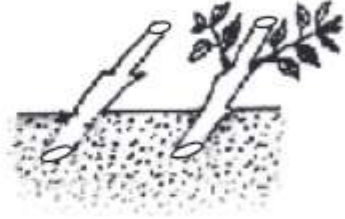
### পাঠ-৬ : কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরি পদ্ধতি

উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরির পদ্ধতি এক ধরনের কৃত্রিম অঙ্গাজ প্রজনন পদ্ধতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে জানতে পেরেছি। এ পাঠে আমরা আরও কয়েকটি কৃত্রিম অঙ্গাজ প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব।

**কাজ :** কাণ্ড খণ্ড থেকে নতুন চারা উৎপাদন (জোড়ায় কাজ)।

চিত্রে শাখা কলম, গুটি কলম ও জোড়া কলম পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ কর। কোনটি কোন প্রকারের কৃত্রিম অঙ্গাজ পদ্ধতি তা শনাক্ত কর।

১. **শাখা কলম বা কাটিং :** যখন উদ্ভিদের শাখা থেকে কর্তন বা ছেদ কলম তৈরি করা হয় তখন তাকে শাখা কলম বা কাটিং বলে। এ পদ্ধতিতে একটি বৃক্ষের শাখা কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শাখাটি স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে নতুন গাছে পরিণত হয়। যেমন- গোলাপ, শিমুল, মান্দার ইত্যাদি।



চিত্র- ৬.১৫: শাখা কলম

২. **গুটি কলম :** এ পদ্ধতিতে ভালো জাতের মাতৃগাছ থেকে কলম করে নতুন গাছ তৈরি করা হয়। গুটি কলম খুবই জনপ্রিয় ও সহজ পদ্ধতি। লেবু, পেয়ারা, সফেদা, লিচু, রজ্জান প্রভৃতি গাছে এ পদ্ধতিতে কলম করা হয়। গুটি কলম তৈরির জন্য এক বছর বয়সের সতেজ ডাল নির্বাচন করতে হবে। এবার তিনভাগ দোআঁশ মাটির সাথে একভাগ পচা গোবর সার মিশিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। চিত্রের মতো করে ধারালো ছুরি দিয়ে নির্বাচিত কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে অন্তত ৬০ সেমি নিচের ৫ সেমি অংশের বাকল গোল করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। বাকলমুক্ত অংশ প্রথমে ছুরির ভোতা পাশ দিয়ে একটু ঘষে সবুজাভ পিচ্ছিল আবরণ তুলে নিতে হবে। এবার বাকলমুক্ত অংশে চিত্রের মতো করে পেস্ট পলিথিনে মুড়ে দুই মুখ সুতা দিয়ে বাঁধতে হবে। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা অংশে সাদা শিকড় পলিথিনের বাইরে থেকে দেখা যাবে। শিকড় ভালো করে গজালে এবং বাদামি রঙের হলে ডালটিকে কেটে টবে লাগিয়ে কয়েকদিন ছায়ায় রাখতে হবে। মাঝে মাঝে টবের মাটিতে পানি দিতে হবে। রোদে রাখলে কয়েকদিন পর নতুন পাতা গজাবে।

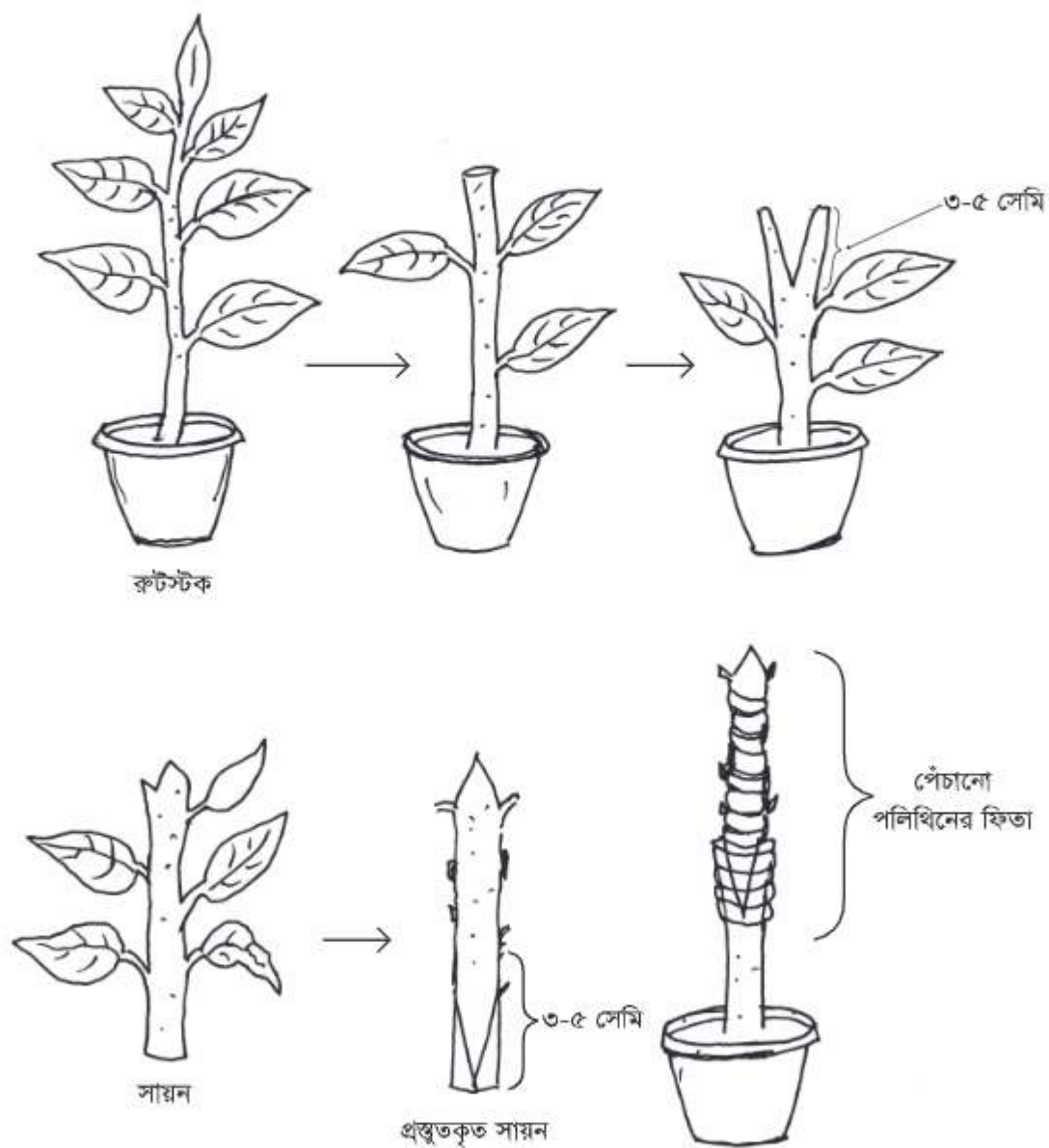


চিত্র- ৬.১৬ : গুটি কলম

## ৩. বিযুক্ত জোড় কলম

এ কলমের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্রেফট গ্রাফটিং

## ক্রেফট গ্রাফটিং



চিত্র : ৬.১৭ আমের ক্রেফট গ্রাফটিং পদ্ধতির ধাপসমূহ



**বিযুক্ত জোড় কলম :** বিযুক্ত জোড় কলমের মধ্যে ভিনিয়ার গ্রাফটিং ও ক্রেফ্ট গ্রাফটিং অন্যতম। তবে বর্তমানে ক্রেফ্ট গ্রাফটিং বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ পদ্ধতিটি সহজ এবং সফলতার হার বেশি। আম, কাঁঠাল, কামরাঙ্গা, জলপাই, কদবেল, সফেদা, গোলাপজাম, জাম ইত্যাদির ক্রেফ্ট গ্রাফটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। আমরা আমের ক্রেফ্ট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে উন্নত জাতের চারা তৈরি সম্পর্কে জানব।

আমরা জানি জোড় কলমে আটির চারা গাছকে রুটস্টক এবং উন্নতজাতের গাছের শাখাকে সায়ন বলে। আমের ক্রেফ্ট গ্রাফটিং বছরে দুবার করা যায়। বর্ষার আগে মার্চ থেকে মে মাস এবং বর্ষার পরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। ৩-১৫ মাস বয়সের রুটস্টক উত্তম। সায়ন হিসেবে এমন শাখা নির্বাচন করতে হবে যার শীর্ষ কুঁড়ি সজীব ও অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফুটবে। ১০-১৫ সেমি লম্বা সায়ন যার পাতা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে, এমন শাখা নির্বাচন করতে হবে। এবার ধারালো ছুরির সাহায্যে সায়ন থেকে পাতা ছাড়াতে হবে। এবার সায়নের নিচের দিকে তেরছাভাবে 'ভি' আকৃতি করে ৩-৫ সেমি পরিমাণ কাটতে হবে। অতঃপর রুটস্টকের গোড়া থেকে ৪০-৪৫ সেমি উপরে কাণ্ডটি গোল করে কাটতে হবে। কাটা অংশের নিচে যেন ৩-৪ টি পাতা থাকে। এবার ধারাল ছুরির সাহায্যে কাটা অংশের মাঝ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে ৩-৫ সেমি ফাড়াতে হবে। ঐ ফাঁটলে সায়নটি প্রবেশ করিয়ে পলিথিনের ফিতা দিয়ে নিচ থেকে সায়নের প্রায় কুঁড়ি পর্যন্ত শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তার সমব্যাসের না হলে সায়নের যেকোনো এক পাশ রুটস্টকের এক পাশের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর খেয়াল রাখতে হবে রুটস্টকের কাণ্ড থেকে কোনো শাখা প্রশাখা যেন বের না হয়। বের হলে তা ভেঙে দিতে হবে। ১-২ মাস থেকে ৩ মাসের মধ্যে কলম জোড়া লেগে যায়। ভালোভাবে জোড়া লেগে গেলে পলিথিনের বাঁধন কেটে ছাড়িয়ে নিতে হবে। না কাটলে পলিথিন সায়নের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সায়ন ভেঙে যায়।

**কাজ :** বিভিন্ন দলে শাখা কলম, গুটি কলম ও জোড় কলম নিয়ে আলোচনা কর। প্রত্যেক দল নির্ধারিত কলমটির চিত্র পোস্টার পেপারে আঁক। এবার উপস্থাপন কর।

**নতুন শব্দ :** শাখা কলম, গুটি কলম, ভিনিয়ার কলম, সায়ন

### পাঠ : ৭ কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী কাঠের ব্যবহার

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাঠের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। তোমাদের বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে নিয়ে ভাব। এসব স্থানে কী কী জিনিস তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়? কোন কোন গাছের কাঠ কী কী কাজে ব্যবহার হয়?

এসো এবার আমরা কাঠের বিস্তৃত ব্যবহার শিখি।

**১. গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরি:** বাসগৃহের খুঁটি, আড়া, পাটাতন ও বেড়ার চাটাই তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়। এছাড়া জানালা-দরজার ফ্রেমও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শাল, সেগুন, সুন্দরী, কড়ই, দেবদারু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব কাজে ব্যবহার হয়।

**২. আসবাবপত্র তৈরি:** চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, আলমারি প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। মেহগনি, সেগুন, কড়ই, কাঁঠাল, রেইনট্রি প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়।

**৩. যানবাহন তৈরি:** নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, বাস, ট্রাক তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়। এছাড়া গরুর গাড়ি, রিকশা, ভ্যান, রেল লাইনের স্পিয়ার প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শাল, সুন্দরী, জারুল, বাবলা, পিতরাজ, মেহগনি প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার হয়।

**৪. যন্ত্রপাতি তৈরি:** লাজল, জোয়াল, আচড়া, ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। নানারকম খেলার সামগ্রীও কাঠ দিয়ে বানানো হয়। পেন্সিল, কাগজ তৈরিতেও কাঠ ব্যবহার করা হয়। তাল, বাবলা, গাব, লটকন ও গেওয়া কাঠ দিয়ে এসব সামগ্রী তৈরি হয়।

**৫. জ্বালানি কাঠ:** আম, মন্দার, পিতরাজ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ বা বর্জ্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া দেয়াশলাই তৈরি হয় গেওয়া, শিমুল, কদম ও ছাতিম গাছের কাঠ দিয়ে। প্লাইউড তৈরিতে আম, পিতরাজ, কদম কাঠের ব্যবহার হয়। কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেজিং বাজ।

কাজ : কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার (দলীয় কাজ)		
কাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্র	কোন কোন কাজে কীভাবে কাঠ ব্যবহার হয় তার ২টি উদাহরণ দাও	কাঠ উৎপাদনকারী ২টি উদ্ভিদের নাম লেখ
১. গৃহ নির্মাণ		
২. আসবাবপত্র তৈরি		
৩. যানবাহন তৈরি		
৪. যন্ত্রপাতি তৈরি		
৫. জ্বালানি		

### পাঠ : ৮ কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী বাঁশের ব্যবহার

বাঁশ আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে। তোমরা প্রত্যেকে বাঁশের একটি করে ব্যবহার বলো। এবার এসো আমরা বাঁশের ব্যবহার সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জেনে নেই।

১. নির্মাণ কাজে বাঁশ : গ্রামীণ স্বল্প আয়ের মানুষেরা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য বাঁশের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বরাক ও এ জাতীয় শক্ত বাঁশ গৃহনির্মাণে বেশি ব্যবহার হয়।

২. আসবাবপত্র তৈরিতে বাঁশ : প্রধানত মূলি, মরাল ও তল্লা বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হয়। বুকশেলফ, সোফা, মোড়া, চেয়ার প্রভৃতি এসব বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়।

৩. সজ্জিতকরণে বাঁশ : মরাল, তল্লা ও সূক্ষ্ম আঁশসম্পন্ন বাঁশ দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়। ঘরবাড়ি ও অফিস সজ্জিতকরণে এসব বাঁশের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪. যন্ত্রপাতি তৈরিতে বাঁশ : শক্ত ধরনের বরাক বাঁশ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, মই, আঁচড়া প্রভৃতি বরাক বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়।

৫. যানবাহন তৈরি ও জ্বালানি হিসেবে বাঁশ : শক্ত ধরনের বরাক বাঁশ যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। রিকশা, নৌকা, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। সব ধরনের বাঁশ, বাঁশপাতা ও অন্যান্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ৬.২০ : বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র



## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক. বাংলাদেশের সব জেলাতেই ..... চাষ হয়।  
 খ. বাঁশগাছে একশত বছরে একবার ..... ও ..... হয়।  
 গ. কাঁঠাল একটি বহুবিধ ব্যবহার ..... উদ্ভিদ।  
 ঘ. আমাদের বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা ..... ভাগ।  
 ঙ. .... আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে।

### মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	পত্রঝরা	তেঁতুল
২.	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ	বাঁশ
৩.	বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল ঘাস	মেহগনি
৪.	কাঠের রং লাল হলুদ	আম
৫.	চিরহরিৎ উদ্ভিদ	কাঁঠাল

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

- ক. বনায়ন কাকে বলে?  
 খ. ভেষজ উদ্ভিদ কাকে বলে?  
 গ. কোন জমিতে মেহগনি ভালো জন্মে?  
 ঘ. বাঁশের বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিগুলো কী কী ?

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ক. মেহগনি গাছের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।  
 খ. কাঁঠাল গাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।  
 গ. বাঁশ গাছের ব্যবহার বর্ণনা কর।  
 ঘ. গুটি কলম পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্যাকেজিং বাস্ক তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?

- |            |          |
|------------|----------|
| ক. কদম     | খ. শিমুল |
| গ. কেরোসিন | ঘ. ছাতিম |

২. নিম্ন গাছের পত্রফলকগুলো—

- i. লম্বাটে
- ii. ডিম্বাকৃতির
- iii. বর্ষাকৃতির

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রহিম ও করিম দুই বন্ধু। তারা দুজন উন্নত ফার্নিচার তৈরির উদ্দেশ্যে একই জাতীয় এবং মিহি আঁশের বনজ গাছের ২টি ভিন্ন ভিন্ন গুঁড়ি ক্রয় করলেন। একই কাঠমিস্ত্রি দিয়ে ফার্নিচার তৈরির পর দেখা গেল করিমের ফার্নিচারে কাক্ষিত রং গাঢ় কালচে হলেও রহিমের ফার্নিচারের রং লালচে খয়েরি হয়েছে। এতে রহিমের মন খারাপ হয়ে গেল।

৩. রহিম ও করিমের ক্রয় করা গাছটি ছিল—

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. সেগুন  | খ. কাঁঠাল  |
| গ. মেহগনি | ঘ. আকাশমনি |

৪. করিমের ফার্নিচার উন্নত হওয়ার কারণ গাছটির গুঁড়ি—

- i. বেশি পরিপক্ব ছিল
- ii. মিহি আঁশের ছিল
- iii. খুব সুন্দর পলিশ নিয়েছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

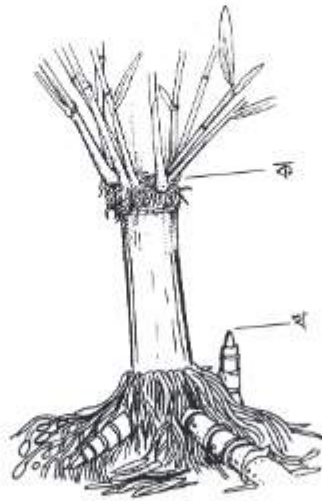
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাজিদ প্রায়ই পেটের অসুখ ও চর্মরোগে ভোগে। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলে দাদা সাজিদকে তাঁর বাগানের একটি গাছের পাতা এবং বাকলের রস খাওয়ান ও শরীরে লাগিয়ে দেন। এতে সে সুস্থ হয়ে উঠে। এ ছাড়া দাদা সাজিদকে তাঁর বাড়ির বিশেষ একটি ফলের বাগানও ঘুরিয়ে দেখান। সাজিদকে তাঁর দাদা আকারে সর্বাপেক্ষা বড় ও বিশেষ গুণসম্পন্ন ঐ ফলটি সম্পর্কে ধারণা দেন।

- ক. মেহগনি গাছের একটি প্রজাতির নাম লেখ।
- খ. বাঁশকে নির্মাণ সামগ্রী বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাজিদের দাদার বাগানের ঐ ফলটি বিশেষ গুণসম্পন্ন কেন, কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষিতে সাজিদের ব্যবহার করা গাছটির উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

২.



- ক. পত্রঝরা উদ্ভিদ কাকে বলে?
- খ. কাঁঠাল গাছকে বন্যামুক্ত স্থানে রোপণ করতে হয় কেন ব্যাখ্যা কর।
- গ. উপরের চিত্রে প্রদর্শিত ক ও খ এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তারে ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. কৃষিজ সামগ্রী নির্মাণ কাজে চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত



# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-কৃষিশিক্ষা

গুরুজনকে মান্য করো ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।